৫

পদ্য লেখার প্রতি অনুরাগ ছিল আমার বরাবরের। চোদ্দ পনের বছর বয়স থেকে তো বটেই, তার একটু আগেই হবে, বই পরে নয়। সে কিযে সব ছাইভস্ম রচনা আর কেনই বা সে উটকো অকারন প্রয়াস, অতশত না ভেবেইচিন্তেই একটা সময় অহেতুক লিখে গিয়েছি অগুন্তি পদ্য। কিছু পদ্য মানানসই ছন্দে মিলানো চিরাচরিত মিত্রাক্ষরে লেখা, আবার কিছু পদ্য লেখার প্রচেষ্টা করেছি 'আধুনিক' গোছের। সে সব আধুনিক পদ্যে ছন্দের বালাই নেই তেমন কিছু। ওই সমকালীন কবিরা যেমন ভাবে আধুনিক কবিতা লিখতেন, ওই ধরণের। সামান্য অক্ষম ভাবে আয়ত্ত করা আরকি। তবে সাধারণ ছন্দমিলানো কবিতায়ে স্বতঃস্ফূর্ত আরাম পেতাম বেশি।

মধ্যকৈশোরে এহেন অর্বাচীন কাব্যরোগ তো চরম প্রকারে ধরে গিয়েছিলই, বরং খুব বেশি মাত্রায়ে বেড়ে গিয়েছিল যুবাবয়েসে লেখাপড়া'র চাপ ক্রমশ কমে যাওয়ার পর। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরের ফাইনাল পরীক্ষায়ে উতরে গিয়ে এবং অনায়াসে একটি নামজাদা ভাল প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে গিয়ে, সপ্তাহান্তে আমার হাতে তখন অঢেল সময়। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। তাছাড়া প্রতিনিয়ত আমার গতিবিধির উপর নজর রাখা বা বকাঝকা করার কেউই তেমন ছিলেননা। ভাইটি তখন বয়ঃসন্ধি'র মধ্য দিয়ে চলেছে এবং মায়ের খানিকটা নজর তখন তাঁর ছোট ছেলেটির দিকেই। তবুও বড়'টি মাস চারেক এর অক্লান্ত পরিশমে 'একবারেই' পাশ করে যাওয়াতে মা বাবা তখন অতিমাত্রায় গর্বিত ও মাঝে মধ্যেই পালটি ঘরের সুশ্রী সুশীলা কোন কন্যা দেখলেই বা খবরটুকু মাত্র পেলেই ব্যাগ্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বিয়ের সম্বন্ধ করতে।

সে সময় সোম থেকে শুক্রের সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই, শনিবার রাত থেকেই শুরু হয়ে যেত আমার পদ্যরচনা। চলতো সেই মাঝরাত গড়িয়ে শেষরাত পর্যন্ত। মনে পড়ে কোন কোন দিন এমনও হয়ে যেত রোববার ভোর অবধি টেনে দিতাম অনায়াসে। দু তিন খানা ভাল যথোচিত পদ্য না লিখতে পারলে ঘুমই আসতনা ভালরকম। অবশ্য সে পদ্য কাউকে পড়ানোর জন্য নয়। শুধুই যেন নিজেরই জন্য লেখা, নিজেরই মনের পরিতৃপ্তি। নিজের পদ্যকে সার্বজনীন করে তোলা বা ডেকে ডেকে আর পাঁচজনকে পড়ে শোনানো উদ্দেশ্য ছিলোনা মোটেও। এছাড়া বোধহয় একটা লুকোনো লজ্জাও ছিল, যদি কেউ আমার ওই গোপন পদ্যরচনাগুলির অমর্যাদা করেন? যদিবা কেউ খামোখা বিদ্রুপ করে বসেন বা অযথা উপহাস?

আগেই বলেছি, ওই সময় নাগাদ বন্ধুর সংখ্যাও গিয়েছিল বেশ কমে। বালিগঞ্জ পাড়ার পুরোনো বন্ধুবান্ধবেরা কেউ কেউ আমার চাকরিবাকরি, অফিসের জামা-প্যান্ট-টাই, চকচকে জুতো, পেশাদারী ঠাঁটবাট, বিড়ি ছেড়ে দামী সিগারেট অথবা রোজ সকালে ট্যাক্সি চেপে অফিস যাওয়ার রেওয়াজ, ইত্যাদি দেখেশুনে একেবারে অভিভুত হয়ে পড়েছিল। আবার কমজোরি কেউ কেউ আমাকে দূর থেকে দেখলেই হতভম্ব হয়ে কথা বলবে কি বলবেনা নির্ণয় করতে করতেই সময় নিয়ে নিত অনেক। অন্যদিকে আমিও ওদের মত দুচারজনকে দেখে খানিক বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েই কিনা জানিনা, একটু বোধহয় অপ্রস্তুতই হয়ে পড়তাম। শুধু তাই নয়, উচিত অনুচিত উপলব্ধি না করে, দুচারজনকে সে সময় সম্ভবত নিজের অজান্তেই উপেক্ষা করে ফেলেছিলাম, এমনও হতে পারে। তাছাড়া বড়লোক বন্ধুদের মধ্যে প্রায় অনেকেই তখন বিদেশে 'এমবিএ' করছে। কিছু বন্ধু আমার মতই কর্মব্যাস্ত আর বাকি সকলে বেশির ভাগ সময় জীবিকা অন্বেষণেই কাটাত। ওদের কাছে তখন আড্ডাটা হয়ে গিয়েছিল কতকটা গৌণ।

ওই বন্ধুবিহীন শনিবারের রাতগুলি আর বিশেষ করে রোববারের সকালটি ছিল আমার কাছে যেন ছিল একরকম নিজেকে নতুন করে যাচাই করে নেওয়ার সময়। আমার বাংলা শব্দ'র উপর সেই ছেলেবেলা'র মত পটুতা বা পদ্য লেখার কল্পনাশক্তি কি আদৌ অবশিষ্ট আছে? নাকি ওই টানা দু তিন বছর ক্লান্তিকর

হিসাবশাস্ত্র, কোম্পানি আইন, ইনকাম ট্যাক্স প্রভৃতি অধ্যয়নে মর্চে ধরেছে আমার ধৃতি'তে? নিয়মিত শনিবার রাতে পদ্য রচনা করে, রোববার সকাল সকাল বারতিনেক পড়েই, ব্যাস... তারপর সেই পদ্যের পৃষ্ঠাগুলি যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত, কোথায় যে বিলুপ্ত হত আমার সারা রাত্রি জেগে করা সৃষ্টি, তার এখন আর কোন খতিয়ান নেই। দুএক দিন পরে হারিয়েই যেত ওইসব রচনা। কোন ধারাবাহিক ও যথাযথ খাতাপত্তরও ছিলোনা আমার। এমনকি খসড়া করার পর, পদ্যগুলি চূড়ান্ত করে, উপযুক্ত ভাবে, যথাবৎ টুকেও রাখিনি কখনও।

তবে এটুকু বলতে পারি, ভীষণ ভয়ঙ্কর রকমের এক সৃষ্টিশীল সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে কেটেছিল সময়টা। কিছু পদ্য এমন লিখতাম, যেগুলি হত কিনা মজার ও আজগুবি ধরনের। মূলত লিমেরিক গোছের (পাঁচপদী নয় অবশ্য), এক্কেবারে লঘু ও চার মাত্রার ছন্দ মেলানো পদ্য। আর বিষয়বস্তু মুখ্যত হত নিকট কোন বন্ধুবান্ধব বা অফিসের বন্ধুস্থানীয় সহকর্মীদের চরিত্র বর্ণনা করে। অফিসে সে সময়, প্রকৃতপক্ষে অল্পবিস্তর সবাইকে নিয়েই কিছু না কিছু ছন্দ করে লিখেছি, পদ্য করে লিখেছি বা লিখতে বাধ্য হয়েছি। লোকমুখে শুনে, সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আমার কাছে এসে সরাসরি দাবি করে বসতেন, যে আমার পরবর্তী পদ্যটি যেন তাঁর উপরেই লেখা হয়। এমনকি বারদুয়েক কলকাতা অফিসের খোদ বড়সাহেব'দের ঘর থেকেও তলব এসেছে বলে মনে পড়ছে এখন। একথা ওকথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হত, "তুমি নাকি ভাই বেশ মজার মজার ছড়া লেখ? তা সময় পেলে আমাকে নিয়ে একটা লিখো নাহয়.."। শালা, এ যেন বইমেলায়ে ঘাসের উপর বসা আর্ট কলেজের অভাবী ছাত্রকে দিয়ে একটা সস্তায় নিজের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেওয়া। বিনবাক্যব্যায়ে লিখেও দিতাম আমি ছয়-সাত লাইন। ওই সাহেবেরই একটু স্তুতি-প্রশস্তি, সামান্য হাস্যরসের মোড়কে। আর ওতেই বাবুটি হয়ে যেতেন দারণ খুশি। ভাঁজ করে পদ্য লেখা কাগজটি যত্ন করে পকেটে পুরে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতেন গিন্নিকে পড়াবেন বলে। একবার তো মনে পড়ছে, আমাদের কোম্পানীর অন্যতম বরিষ্ঠ মালিক শ্রী প্রশান্ত কুমার মল্লিক সাহেবের ফেয়ারওয়েল পার্টি উপলক্ষে আমাকে বলা হয়েছিল, সুমনের গানের মতন একটা 'তোমাকে চাই' গোছের গান রচনা করে দিতে হবে দুদিনের মধ্যে। যেটি কিনা সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের পাশে 'প্যারিশ হলে'র' জমায়েতে ভরদুপুর বেলায় গেয়ে শোনাতে হবে কোরাস কণ্ঠে। তা বলামাত্র লিখেও ফেলেছিলাম একটি সেরকম সুমনের গান। সুরটুর বসিয়ে, মল্লিক সাহেবের সামনে খালি গলায় গাওয়াও হয়েছিল সে গান। মনে পড়ে, খুব প্রশংসাও পেয়েছিলাম স্বয়ং মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে। তবে জানাতে লজ্জা নেই, সে গানটি সুরে হলেও, কথাগুলি হয়েছিল একদম যাচ্ছেতাই ও ভীষণ অর্থহীন (ভাগ্যিশ সুমন চাটুয্যে জানতে পারেননি, তাঁর গানেরও প্যারোডি আছে)। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য, মুম্বই'এর পুরোনো অফিসে, আমার এক দাদাস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা মজার দু একটি পদ্য অবশ্য খুব তারিফ পেয়েছিল। আসলে কিছু লোক তো থাকবেনই, যারা মজার ছড়া পড়ে সত্যিকারের রসোপলব্ধি করতে পারবেন, মনিব সুলভ মনোভাব না দেখিয়ে। তবে সে কলকাতা অফিসের লেখা রগুড়ে ছড়া বা প্যারোডি গান ছিল নিতান্তই অন্য'র জন্য রচনা করা। নিজের কাছে রাখিনি কিছুই, বিলিয়ে দিয়েছি।

সপ্তাহান্তের পদ্যগুলি বরং ছিল রাশভারী ও গম্ভীর গোছের। আমার একান্ত নিজস্ব, খুব ব্যাক্তিগত ও গোপন। এখন বুঝি যে সে সব গুপ্ত পদ্যগুলি আবার বেশির ভাগই হয়ে পড়ত একটু অকারন ব্যাঙ্গধর্মী। পদ্যের মধ্যেই থাকবে নিজের কাছেই করা নিজের নির্বোধ প্রশ্ন এবং নিজেরই দেওয়া আরও নির্বোধ উত্তর। বেশির ভাগ লেখাতেই, ওই ব্যাঙ্গের মাধ্যমেই অকারণে প্রকট হয়ে উঠত নিজস্ব আবেগ ও বিষণ্ন মনের একটি প্রতিচ্ছবি। যেমন অনেক আগে আমারই লেখা, একটি অতিশয় দুর্বলচিত্ত ও ক্ষীনবুদ্ধি পদ্যকে নমুনা স্বরূপ বলা যায়:

"পদ্য লিখেছি নিজের খেয়ালে / নিজের জন্য নিজে /
নিজের ভাবনা নিজের চিন্তা / নিজ নিজ মনসিজে।

নিজের দুঃখ, নিজের আল্লাহদ / নিজের সাথেই আড়ি / নিজের সঙ্গে ভাব ভালবাসা / নিজেকে ধরেই মারি।
নিজেই লিখব, ছিঁড়ব নিজেই / নিজেই করব যতন / যা খুশি আমি লিখে যেতে পারি / নিজের মনের মতন"।

মনে পড়ছে পদ্যটির নামকরণ করেছিলাম, "নিজ গুনে ক্ষমা"। খুব হাসি পায় ভেবে এখন। কোন যে বিশেষ অজানা কারণে নিজের উপরে এতটা সংবেদনশীল হয়ে অকারণ প্রশ্নোত্তর করেছিলাম ও অদ্ভুত রকমের এক অনর্থক রাগ ও বিমর্ষতা ফুটে উঠেছিল, তা এখন বলা বেশ মুশকিল। তবে এটুকু বলতে বাধা নেই যে পদ্যগুলি সেই সময় নিজে নিজে একা ঘরে বসে আবৃত্তি করতে বেশ সন্তোষজনক লাগত কিন্তু। ওই ১৯৯৭ / ১৯৯৮ এ ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সে পদ্যগুলি লিখতে ও পড়তে দারুণ ছন্দময় ও ভাবপ্রবণ লাগলেও, এখন চুয়াল্লিশে এসে বেশ বুঝতে পারি যে সেগুলি আদপে ছিল অন্তঃসারশুন্য ও নিতান্তই কাঁচা। আর সে সব ভাবতে বসে এখন বেশ কৌতুকও অনুভব করি।

পদ্য লেখার সাথে সাথে কবিতা পড়াও চলত আমার খুব। ছেলেবেলায়ে বা কৈশোরে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ'এর দৌলতে রবীন্দ্রনাথ পড়া ছিল আমাদের জন্য একরকমের বাধ্যতামুলক। ক্লাস থ্রি কি ফোর থেকেই চালু হয়ে যাবেন রবি ঠাকুর আর থাকবেন সেই বারো ক্লাস অবধি। কিশলয়ের 'লুকোচুরি' দিয়ে শুরু করে সেই পাঠ সংকলনের 'ধুলামন্দিরে' গিয়ে শেষ (আমার কিছু নিকটাত্মীয়া অবশ্য তার পরেও চালিয়ে গেছেন।) তদুপরি আমাদের খ্রিস্টান ইশকুলটির মাষ্টারমশাইরা বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন অতিরিক্ত রকমের বেড়ে পাকা। অনেকেই এখন বিশ্বাস করবেননা হয়তো, আমাদের ক্লাস সেভেন অথবা এইটেই শুরু করানো হয়েছিল জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। এমনও হয়েছে যে কপালকুণ্ডলা পড়াতে গিয়ে অমিত দাশগুপ্ত স্যার দুম করে পড়িয়ে ফেললেন ডেসডিমোনা ও মিরান্ডা। আর ওই তিনটি নারী চরিত্রের তুলনামূলক মিল-গরমিল বিশ্লেষণ করে, পরীক্ষায় প্রশ্নও করা হয়েছিল বলে খুব মনে পড়ে। (তবে সে গল্প না হয় অন্য কখনও শোনানো যাবে)।

আমার কবিতা পড়ার হাতেখড়ি হয়েছিল অবশ্য আমার জেঠিমার কাছে। খুব ছোটবেলাতেই উনি কোথা থেকে যেন একটি সঞ্চয়িতা যোগাড় করে এনে আমাদের বেশ কিছু রবি ঠাকুরের সুপরিচিত কবিতা মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছিলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'প্রশ্ন', 'সোনার তরী', 'কৃপণ', 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' – এ সমস্ত কবিতা সন্ধ্যার দিকে প্রায়শই পড়াতেন ও নিয়মমতন কড়া শাসনে পড়া ধরতেন মাঝে মাঝেই। ('বীরপুরুষ' কবিতাটি বাদ... মায়ের জন্য আলাদা করে তুলে রেখেছিলাম কিনা)। এছাড়া ইশকুলে আবৃত্তি'র জন্য ঝাড়া মুখস্থ করতে হয়েছিল আরও প্রায় গোটা তিরিশ ছল্লিশেকের মত কবিতা। ইশকুলে আবৃত্তি'র উপরে জোর দে'য়া হত ভীষণরকম ও রীতিমতন পঞ্চাশ একশো নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হত বছরে তিন বার। রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত', 'দুঃসময়', 'আফ্রিকা, 'বাঁশি', 'আমি' বা নজরুলের 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'বিদ্রোহী', 'ফরিয়াদ' প্রভৃতি আবৃত্তি করে ইশকুলে বাহবা পেয়েছি অনেক বার। একবার তো ক্লাস সেভেনে কি এইটে জীবনানন্দ দাশের 'বোধ' মুখস্থ করে, আবৃত্তি করতে মাঝপথে আটকে গিয়ে, ঢোকটোক গিলে, সে এক ক্লাসভর্তি ছেলেদের মাঝে একাকার কান্ড। বাংলার স্যার তো বেশ বকুনিই দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। ওঁর আমার 'বোধ' আবৃত্তি শুনে মনে হয়েছিল যে আমি কবিতাটির মর্মার্থ সঠিক রূপে না বুঝেই উদ্দেশ্যহীন ভাবে মুখস্থ করে এসেছি। স্যার হয়তো জানেন কিনা জানিনা, জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতাটি আজও ঠিক করে বুঝে উঠতে পারিনি আমি।

তবে রবীন্দ্রনাথ'কে পৃথক রেখে বলতে গেলে, কৈশোরে আমার প্রিয় কবি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ছোটবেলায়ে পাঠ্যবইতে পড়া 'কপোতাক্ষ' ও অমিত স্যারের ভাষায়, মাইকেলের একাধারে বোহেমিয়ান এবং রোমান্টিক দিকগুলি আমাকে অতিমাত্রায় নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। খুব মনে পড়ছে, সম্ভবত অমিত দাশগুপ্ত'র কাছেই শুনেছিলাম যে মাইকেল নাকি মাত্র এক রাতেই দীনবন্ধু মিত্র'র নীলচাষীদের নিয়ে লেখা একটি গোটা নাটক অনুবাদ

করে ফেলেছিলেন ইংরিজিতে। (এখন অবশ্য স্পষ্ট মনে পড়ছেনা, একবার গোলাম মুরশিদ সাহেবের 'আশার ছলনে ভুলি' বইটি দেখে নিতে হবে)। আর ভীষণ পছন্দ ছিল সুকুমার রায়ের পদ্য (সে পছন্দ অবশ্য এখনও পুরোমাত্রায়ে আছে)। 'আবোল তাবোল' যে আমি কতশত বার পড়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। অমন সাবলীল পদ্য ও অসাধারণ ছন্দ আমি সুকুমার ছাড়া আর কারো লেখায়ে আজ অবধি পাইনি (কবি সত্যেন দত্ত ছন্দ মিলিয়ে লিখতেন বটে, কিন্তু সে কেবল কেমন যেন মিলানোর জন্য মিল)। এছাড়া কাজী নজরুলের বেশ কিছু ছন্দময় তেজস্বী কবিতা ও জীবনানন্দ দাশ পড়েও একসময় খুব আনন্দ পেয়েছি। পক্ষান্তরে, সুকান্ত'র কবিতা ছিল অমিত স্যারের কাছে দুচোক্ষের বিষ, আর আমিও স্যারের চ্যালাগিরি করে, কবিকে খুব একটা পছন্দ করতে পারিনি কোনোকালেই।

একটু বয়েস বাড়ার পর ধরেছিলাম ষাট ও সত্তর দশকের 'হাংরি জেনেরেশন' এর পদ্য। খুব বেশি করে পড়তে শুরু করেছিলাম শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় মজুমদারের কবিতা। শক্তি'র কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য', 'হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান' অথবা 'ছিন্ন বিছিন্ন' আমার মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল তখন। 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' বা 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' তো তখন আমার কাছে এককথায় রূপকথার এপিক। অন্যদিকে কবি বিনয় মজুমদারের কবিতা যখন প্রথমটা পড়ি, খুব একটা অনুরাগী হয়ে পড়িনি প্রথমেই। কিন্তু একবার যখন পড়েছি, 'ফিরে এসো, চাকা', শ্রদ্ধা চরম বেড়ে গিয়েছিল কবির প্রতি। পরে ইতিহাস পড়ে যখন জানতে পেরেছি, যে 'চাকা' মানে কবি তাঁর সমসাময়িক গায়ত্রী চক্রবর্তী'র কথা বলেছেন, তখন নিজেকে বেশ বেকুবই লেগেছিল।

অন্ধ ভক্ত বলতে ছিলাম আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতার। সুনীলের একাধিক পদ্য ছিল আমার রোজকার পড়ার সঙ্গী। সুনীলের প্রেমের কবিতা পড়ে আমার কাছে 'প্রেম' কথাটির সংজ্ঞা পেয়েছিল এক নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন তাৎপর্য। সুনীল পড়ার আগে, প্রেমের অর্থ বলতে আমার কাছে ছিল নারীপুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র মানসিক ও শারীরিক ভালবাসা। প্রেম ব্যাপারটি কেমন যেন মনে হত আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। সুনীলের লেখায় 'নীরার' প্রেমের পেছনেও স্বাভাবিক ভাবে এসেছিল রূপ, সৌন্দর্য, মাঝে মাঝে টুকরো শরীরী আকর্ষণ। কিন্তু কি নির্মল পাপহীন সেই প্রেম, কি সাবলীল ভাবে কবি শরীরী বিষয়ে বলেন। আর যা বলেন, সব কথাই যেন অদ্ভুত রকম আমারই মতন মধ্যবিত্ত। যেন আমারই কথা লিখছেন কবি, নীরা সেখানে হয়ে উঠেছে যেন আমারই প্রেম, হয়ে উঠেছে আমারই প্রেমের প্রকাশ। বিশেষত ওই সময়টি, সুনীল যেন একরকম বসবাসই করতেন আমার মধ্যে। গোগ্রাসে পাগলের মতন গিলেছি তখন:

"বাস স্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে–
দিকচিহ্নহীন–
বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।"
(হঠাৎ নীরার জন্য)

ঘনঘন পড়তাম আর পড়তে পড়তে ভাবতাম, এতো আমারই লাইন, আমারই কথা, এ লেখার তো কথা ছিল আমার.. সুনীল হঠাৎ লিখে ফেললেন কি করে?

অন্যদিকে শক্তি'ও লিখেছেন প্রেম নিয়ে। তিনি সুনীলের মতন না হলেও অন্য জাতের এক প্রেমিক-কবি তো বটেই। প্রেম আর একই সঙ্গে স্বপ্ন, প্রকৃতি ও প্রতীকের কবি শক্তি। তার প্রেম তাই একাকার হয়ে গেছে এ সবের সঙ্গে। শক্তি তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম রেখেছিলেন 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য'। এবং 'ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি' নামকরন করেছিলেন অন্য আরেকটি কাব্যগ্রন্থের। তবুও 'প্রেম, ভালবাসা, নারী' প্রভৃতি শব্দ কিংবা 'তুমি' উল্লেখ করে কোনও নারীর উদ্দেশ্যে লেখা, কোনও নারীর নাম বা যৌনতা ইত্যাদি তার রচনায় দুর্লক্ষ্য। ছোট মুখে বড় কথা বলা

হয়ে যেতে পারে, তবুও শক্তি'র মধ্যে আমি কেন জানিনা জীবনানন্দ দাশের ছাপ পেয়েছি অনেকটা। প্রকৃতির একটা অসাধারণ অমার্জিত রূপও আমি দেখতে পেয়েছি শক্তি'র কয়েকটি পদ্যে। তবে প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে শক্তি'র বিরহবোধ ছিল বড় স্বাভাবিক ও প্রাত্যহিক। বিচ্ছেদ ছিল তার কাছে একপ্রকার চরম বিশ্বাসভঙ্গ। তাই গভীর অভিমানের যন্ত্রণায় পীড়িত তিনি। শক্তি'র দুএকটা লাইন তো ভুলতে পারা যাবেনা সারাজীবন-

"যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো

.....

বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো

.....

মুখচ্ছবি সুশ্রী অমন, কপাল জুড়ে কী পরেছো..."

(পরস্ত্রী)

এসব দিনের পর দিন পড়তে পড়তেই, আমিও আমার সামর্থের পরিমাণ না বুঝেই, হয়ে উঠেছিলাম পাক্কা কবি। শুধু তফাত এই যে, আমার কবিতা কেউই পড়লোনা, বা পড়ার সুযোগই দিলামনা হয়তো। আমার নিকট শুভাকাঙ্খীদের ভিতরে বেশ অনেকেই প্রশংসা করে বলতেন, "পাঠিয়ে দেখোই না একবার 'দেশ' পত্রিকায়, খুব বেশি হলে ছাপবেনা। গালাগালি তো আর দেবেনা"। কিন্তু ওই শেষ অবধি আর সাহস করে উঠতে পারিনি। একবার তো ঠিক দুর্গাপুজা'র সপ্তাহখানেক আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি পদ্য প্রতিযোগিতা'র খবর পেয়ে, বেশ জেদের বশেই দুম করে পাঠিয়ে দিলাম চার খানা পদ্য। তার কিছুকাল পরেই, বাড়ী'তে এল একটি লম্বা কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা চিঠি আর তারই সাথে পাঁচটি পাঁচ রঙের সদ্য বাজারে আসা 'রেনল্ডস্' কলম। স্বান্তনা পুরস্কার হিসেবে। প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন অহনা বিশ্বাস। আনন্দবাজারে বেশ ফলাও করেই প্রকাশিতও করা হয়েছিল সেই প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতাটি। আমার সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাটি পড়ে, নিজের উপর যা না রাগ হয়েছিল, খুবই বেশি পরিমানে খেপে উঠেছিলাম ওই অহনা নাম্নী নারীকবিটির উপর। এমনকি বন্ধুবান্ধব ও কিছু নিকট কয়েকজনের কাছে তো মিথ্যাও রটিয়ে দিয়েছিলাম যে ওই অহনা আসলে হল গিয়ে অনিল বিশ্বাসের কন্যা। যত সব চোট্টামি করে আর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে খবরের কাগজের কোম্পানীর প্রাইজ জিতে নেওয়া। আর বলাই বাহুল্য, যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় শ্রী অনিল বিশ্বাস মহাশয় ছিলেন তৎকালীন বামফ্রন্টের সর্বময় কর্তা। পরে 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত শ্রীমতি অহনা বিশ্বাসের লেখা কবিতা পড়েছি। শুধু পড়েছি নয়, পড়ে একপ্রকার মুগ্ধই হয়েছি বলা চলে।

তবে এখন এই মাঝবয়েসে যখন মাঝে মাঝে আমার লেখা পলকা পদ্যগুলির কথা মনে পড়ে, বেদনার চেয়ে বরং আনন্দবোধই হয় বেশি। যেমন প্রতিদিনই মানুষ ভাবে, গতকাল কেমনটি নির্বুদ্ধি ছিলাম, আজ ভাগ্যিশ গতকালের ভুলটি আবার করিনি। খুব অবাক লাগে এই ভেবে যে, সেই আমি যেকিনা আমার 'বন্ধু'র কোলে বসে, একটা কালো আলোয়ান জড়িয়ে পড়তাম 'তুতু-ভুতু' বা 'টুনটুনির বই', দাদুর ভুঁড়ি'র উপরে বসে শুনেছি 'চুক আর গেক' বা বিভিন্ন সোভিয়েত দেশের উপকথা, সে কিনা বড় বয়সে এত পদ্য পড়ে? পদ্যই হোক বা গদ্যই হোক, পড়বার অভ্যেসটি কিন্তু ছেলেবেলা'তেই ধরিয়ে দিয়েছিলেন আমার ছোটমাসি, আমার 'বন্ধু'। আজেবাজে প্লাস্টিকের খেলনাপত্তর না কিনে যে টুকটাক বইটই কেনাই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ, সে ভাবনা মাথায় ঢুকিয়েছিলেন স্বয়ং উনিই। সে বাঁটুল দি গ্রেট থেকে টেনিদা... অমর চিত্রকথা থেকে ফেলুদা, গোগোল, কাকাবাবু.. সবই পড়ে ফেলেছিলাম ওঁরই দৌলতে। ('বন্ধুর' সে গল্পগুলি না'হয় খুব শিগগিরই শোনাব অন্য কোন কিস্তিতে, অন্য কোন রোববার)।

এত পদ্য পড়েও, এত রাত জেগেও, বাংলা ভাষাটির উপর গড়পড়তা বাঙ্গালী'র তুলনায় সামান্য দখল বেশি থেকেও, ওই সামান্য মজার চলনসই ছড়া ব্যাতীত, ভাল পদ্য লেখা যে আমার দ্বারা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলো না, তার অনেকগুলি বেশ ন্যায্য কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছিলাম আমি। প্রতিকটি কারণই অবশ্য আমার

নিজস্ব মনগড়া ও সাধারণ পাঠক পাঠিকার সঙ্গে তর্কের জন্যে নয়।

প্রথম ও প্রধান কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, পদ্য লেখা ব্যাপারটি সকলের জন্য নয়। সবার দ্বারা হয়না, কোনোকালে হবেওনা। (বাঙ্গালী যুবক মাত্রেই যে পদ্যের লেখার উপর তার একচেটিয়া অধিকার, এ ধারণাও একদম ভ্রান্ত)। পদ্য লিখতে হলে শুধু ভাব ও ভাষার উপর দখল থাকলেই হবেনা, শুধু ছন্দের বুনন ভাল হলেই হবেনা, শুধু মিল অন্ত্যমিল, শব্দ চয়ন, উপমা হলেই হবেনা। চাই উপযুক্ত ভাবনা যা কিনা সরল রৈখিক গদ্যের থেকে হবে অনেক বেশি আলাদা। মাত্র চল্লিশ পেরিয়েই জীবনানন্দ লিখেছেন – "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে..."। যে কবি তাঁর নিজের মনের অন্তর্নিহিত কথাকে এইরকম সুন্দর সহজবোধ্য করে ঠোঁটের ভাষায়ে নিয়ে আসবেন, তিনিই তো আসল কবি। বাকিরা তো কেবল নিছক আমারই মতন শিশুসুলভ লেখক ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় কারণটি একটু গোলমেলে ও নিয়মবিরুদ্ধ। খুব বিচিত্র ভাবে, কেন জানিনা আমার মনে হয় ভাল পদ্য-টদ্য লিখতে গেলে একটু মাল-টাল খেলে, একটু নেশা-ভাং করলে, একটু ওই বিহার অথবা ঝাড়খন্ডের রুক্ষ মালভূমির পরিবেশে, শক্তি-সুনীলের মত চাঁইবাসা, পালামৌ, ঘাটসিলা ঘুরতে পারলেই বুঝি পদ্য আসে বেশি ও অনায়াসে। দায়িত্ব নিয়েই বলছি, শক্তি সুনীল না হতে পারলেও, টুকটাক হুইস্কি, ব্রান্ডি, ভদকা-তটকা খেতে পেলে, আমার পদ্যও মর্মভেদী হত বেশি। যা ওই যুবাবয়সে গাড়ল মার্কা পদ্য লিখেছি, তাঁর থেকে ঢের ভাল লিখতাম। শনিবারের রাতগুলি আর রোববার এর সকালে ছেলেমানুষি না করে, নিজেকে নিজে নাকাল না করে, নিতান্ত শব্দশাসিত পদ্য না লিখে, মাতাল হয়েই হয়ত প্রকাশ করে দিতে পারতাম নিজের মনের বিশালতা। কিন্তু সেখানেও ছিল মস্ত বাঁধা। নিখাদ পূর্ববঙ্গীয় বাপ মা, ছোটবেলা থেকে মাত্র দুটি জ্ঞানই দিয়ে গিয়েছেন প্রতিনিয়ত। এক লেখাপড়ার পক্ষে ও দুই মদ্যপানের বিপক্ষে। এখন অবশ্য এক নম্বরটি বাদ গিয়ে শুধু দুই নম্বরটির নিয়েই চিন্তা ওনাদের। ওই যে কি একটা চন্দ্রবিন্দু'র গান আছেনা, "আর পারছিনা গুরু, সেই নার্সারি থেকে শুরু"...। তা আমার হাত দিয়ে ভাল পদ্য আর বেরবে কি করে? শুকনোয় কি কিছু হয়, না হয়েছে কোনদিন? শুধু যোগিন্দ্রনাথ সরকারের মতন শিশুসুলভ ছন্দই এলো, সুনীল শক্তির মাদকতা ও রহস্যময়তা এলো কই?

আমার পদ্য লেখার অসাফল্যের তৃতীয় কারণটি হলেন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ও আমার ঘোর অপছন্দের বর্ষাঋতু। মনে পড়ে, প্যালা'র পিসতুতো দাদা 'ফুচুদা' (কিংবা প্যালা নিজে, বা অন্য আরও অনেক চরিত্র) নাকি বর্ষাকাল এলেই বসে যেত কাব্য রচনায়ে। আকাশে একটু মেঘ-টেঘ হলেই বা একটু আধতু বিদ্যুৎ গর্জন করলেই, দু ফোঁটা বৃষ্টি পরলেই, ব্যাঙ-ট্যাং কে দাদুরী-তাদুরি বলে প্যালার ফুচুদা কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতেন ছন্দ মেলাতে। তা ফুচুদার মতন কবি হতে গেলে যদি শুধুমাত্র বর্ষাঋতুরই প্রয়োজন হয়, তাহলে তো একপ্রকার উত্তর পেয়েই গেলাম, কেন হলনা আমার পদ্য লেখা। বর্ষা'র প্রতি অননুরাগ আমার চিরকালের আর অসময়ের বর্ষা তো আমার কাছে আরও বিপজ্জনক।

তা সেবছর কলকাতায় এমনিতেই নিদারুন বিরক্তিকর বর্ষা, ফুচুদার মত পদ্যের প্লট এসেও আসছেনা মাথায়, সব কেমন যেন ঘুলমুলিয়ে যাচ্ছে... এমনই এক বর্ষামুখর সন্ধ্যেবেলা এই সাড়ে আটটা নাগাদ অফিস থেকে আধ-ভেজা হয়ে ফিরেই দেখি এক ষাটোর্ধ প্রৌঢ় আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমাদের ওই বালিগঞ্জের বাসায়। অপেক্ষা করছেন বললে কমিয়ে বলা হবে, বরং বলা উচিত জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন আমার মা'এর সাথে বসে। দু রাউন্ড চা – বিস্কুট ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে তাঁর, শুধু যেন আমারই ফেরার অপেক্ষায়ে রয়েছেন। পড়নে সাদামাটা বুশ শার্ট, বৃষ্টি'র জন্য প্যান্টটি সামান্য গুটনো, খালি পা। এককথায়ে অসাধারণত্ব বলে কিছু নেই। তবুও আমার মত পাজি ও দুরাত্মার'ও বেশ সমীহই হল বুঝি ওঁকে দেখে। একবার গুঢ় অর্থপূর্ণ ভাবে আমাকে একঝলক দেখেই বলেন

কিনা, "দাঁড়াও তো ভাইটি একবার, হাইট'টা একটু দেখে নেই"। বলেন কি ভদ্রলোক, উনি কি জানেননা যে নেহাত বেঁটে হলেও, আমি একজন খাঁটি কবি, সুনীল-শক্তি খেয়েছি গুলে। শনিবার রোববার রাত জেগে পাতার পর পাতা পদ্য লিখি? এধরনের অতর্কিতে আক্রমন অনেক দিন কেউ করেননি, তাও আমার 'খাটো' উচ্চতা'র মত অনুভুতিপ্রবন বিষয় নিয়ে। কিন্তু ওঁর গম্ভীর ব্যারিটোন স্বরে, বা মায়ের চকিত ইশারাতেই হবে, স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে পড়ে তড়িঘড়ি উচ্চতা মাপিয়ে নিলাম। আর তারপরেই কিছু বুঝতে না বুঝতেই চোখ চলে গেল মায়ের হাতে ধরে থাকা একটি সদ্য ছাপানো রঙীন ফটোগ্রাফের উপর।

ঘরেই তোলা ছবি, আহামরি কিছু এমন নয়। যতদুর মনে পড়ছে, ইটইট রঙের শাড়ি পড়া একটি বাচ্চা মেয়ে। খুব সহজ ভাবে, একটি বেতের মোড়ায় সে অনাড়ম্বর ভাবে চেয়ে আছে ক্যামেরার লেন্সের দিকে। চোখে এক অদ্ভুত সরলতা। সাজগোজও নেই বলার মতন বেশি কিছু তেমন, ওই হাতে দুতিন গাছা চূড়ি, ঠোঁটে হয়ত সামান্য হাল্কা রঙ.. ওই অদ্ভুত সারল্য দেখে আমার মতন বহুদর্শী কবিরও হৃত্স্পন্দন সামান্য বেড়ে যায়নি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমার কবিমনে তখন একটিই প্রশ্ন, একটিই জিজ্ঞাসা - এই কি তবে ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম, তাঁর দেওরের মেয়ে? এরই কি পড়নে থাকবে ঢাকাই শাড়ি আর কপালে সিঁদুর? ওই বিরক্তিকর বর্ষা ভুলে, সরল মেয়েটির ছবি দেখে, মুহুর্তে মনে পড়ে গেল, সুনীলের কটি লাইন...

"তখন সে যুবতীকে খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়--
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো—"

ওই সেদিন উচ্চতা মাপিয়েই হয়ে গিয়েছিল আমার পদ্য লেখার ইতি। আর তা একদিক থেকে ভালই হয়েছিল বলা চলে। অসহনীয় কাদা প্যাচপেচে বৃষ্টি ছাড়াও অন্য একটি কারণ খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলাম আর ওই হাবিজাবি পদ্য না লেখার। মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম সেদিনই, শুধু শনি রোববারে কেন, অন্য দিনেও কাগজ কলম ছোঁবনা আর, আর কোন রাতে সপ্ন দেখবনা নীরা'কে...

এ হাত ছুঁয়েছে ওই ইট রঙের শাড়ি পড়া দয়িতা'র ছবি "আমি কি এহাতে কোন পাপ করতে পারি?"

ক্রমশ...